বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস

১৭ মে, ১৯৮১

বিশেষ ক্রোড়পত্র ১৭ মে, ২০১৪

অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর ◆ সহযোগিতা : তথ্য অধিদফতর, তথ্য মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

বঙ্গবন্ধু তনয়া বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৩৩তম স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আমি তাঁকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

মানবদরদি, পরোপকারী, নির্মোহ, গণতন্ত্রের মানসকন্যা শেখ হাসিনা দীর্ঘ ৬ বছর নির্বাসন শেষে ১৯৮১ সালের ১৭ মে বাংলার মাটিতে ফিরে আসেন। এটা ছিল বাংলাদেশের গণতন্ত্রের পুনরযাত্রার জন্য এক বিরল ঘটনা। এর ফলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, স্বাধীনতার মূল্যবোধ ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হন। এ সময় তাঁর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা তৎকালীন পশ্চিম জার্মানিতে থাকায় তাঁরা প্রাণে বেঁচে যান। পরবর্তীতে ৬ বছর লন্ডন ও দিল্লিতে তাঁদের নির্বাসিত জীবন কাটাতে হয়। ১৯৮১ সালে ১৪-১৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ১৯৮১ সালের ১৭ মে বিমান বন্দরে তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য উপস্থিত প্রায় ১৫ লাখ মানুষের হৃদয় ছোঁয়া ভালোবাসায় সিক্ত হলেন শেখ হাসিনা।

শেখ হাসিনা দেশে ফিরে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন শুরু করেন এবং এরই ধারাবাহিকতায় ৯০'র গণআন্দোলনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের বিজয় হয়। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করে এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠন করে। এসময় পাহাড়ি-বাঙালি দীর্ঘমেয়াদি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বন্ধে পার্বত্য শান্তিচুক্তি এবং প্রতিবেশী ভারতের সাথে গঙ্গার পানিবন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তাঁর নেতৃত্বে ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনে ১৪ দলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসে এবং জনগণের কল্যাণে নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে। গণতন্ত্র, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, নারীর ক্ষমতায়ন, বিদ্যুৎ, তথ্য-প্রযুক্তি, গ্রামীণ অবকাঠামো, বৈদেশিক কর্মসংস্থানসহ নানা কর্মসূচির ফলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি সাধারণ নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জোট সরকার পুনরায় ক্ষমতায় এসে সরকার পরিচালনা করছে। গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণে শেখ হাসিনা নিরলসভাবে যে কাজ করে যাচ্ছেন তা বাংলার মানুষের হৃদয়ে চির জাগরূক থাকবে।

আমি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে তাঁর ও তাঁর পরিবারের সকল সদস্যের দীর্ঘায়ু, সুখ-সমৃদ্ধি, কল্যাণ এবং সরকারের অব্যাহত সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

কন্যা ফেরে ঘর

সৈয়দ শামসুল হক

বৃষ্টি সেদিন সতেরোই মে, কন্যা ফেরে ঘর।
আকাশ নয় বাতাস নয়– কাঁদে পঁচাত্তর।
নৌকা বলে চোখের পানি এতদিনেই মুছবে জানি।
লক্ষ মানুষ ভেজে মানুষ, সড়কে আজ কন্যা–
বঙ্গবন্ধুর দেশে ফেরে বঙ্গবন্ধু কন্যা।

পঁচাত্তরের আগস্ট মাসে পনেরোই ভোরবেলা,
সূর্য তখন কেবল শুরু করেছে চোখ মেলা–
হঠাৎ তার চোখের আলো অন্ধ করে কে নেভালো?
চমকে দেখি ইতিহাসের কালো নেকড়ের নখ!
সিঁড়িতে লাশ– রক্তভেজা বাংলাদেশের জনক।

সেই যে ঘন অন্ধকার, সেই যে দুঃসময়
নামলো দেশে– নদীর পানি ফিসফিসিয়ে কয়–
আয় রে আমার বুকে আয় বঙ্গবন্ধুর নৌকায়,
মানুষ আর থাকবে কতকাল অপেক্ষা করে?
কে আছো রে! আয় রে হাতে সোনার বৈঠা ধরে।

বৃষ্টি পড়ে অঝোর ধারে, সড়কে আজ ঢল,
গলুই তুলে অপেক্ষাতে অধীর চঞ্চল
নৌকা ডাকে কই গো মাঝি! কন্যা বলে এই তো আছি,
আর কেউ না আসুক আমি আসবো নদীর পাড়ে।
বাংলাদেশের সূর্যটাকে দেখিই না কে কাড়ে?

সতেরোই মে বৃষ্টি পড়ে, বৃষ্টি মাথায় নিয়ে
মানুষ নামে পথে বিজয় নিশান উড়িয়ে
তাকিয়ে আছে চোখ অপলক, স্বাগতমের লক্ষ লোক
দাঁড়িয়ে আছে অপেক্ষাতে কন্যা কখন আসে–
বাংলাদেশের বুকে আবার নৌকা কখন ভাসে!

কন্যা এলো কন্যা এলো কন্যা ফেরে ঘর,
কন্যা এলো নৌকা আবার ছাড়লো রে বন্দর।
ইতিহাসের সাগরপানে সেই কন্যা বৈঠা টানে।
নৌকা চলে এতদিনের থমকে থাকার পর–
আবার দেশে সূর্য ওঠে পঁচাত্তরের পর!

একে একে ছিন্ন করে সকল অন্ধকার
আজ কন্যার হাতে আমার ভবিষ্যতের ভার।
স্বপ্ন ছিলো পিতার কত সোনার বাংলা নামের মতো
এ দেশ হবে সত্যিকারের সোনায় যেন গড়া।
কন্যা তো নয়, কন্যা সেই স্বপ্নের পরম্পরা ॥

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
এবং
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

বাণী

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে দীর্ঘ নয় মাস অসমসাহসিকতায় লড়াই করে লাখো শহীদের রক্তে বাঙালি জাতি ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতার লাল সূর্য। কিন্তু একাত্তরের পরাজিত শক্তি কখনোই এই স্বাধীনতাকে মেনে নিতে পারেনি। স্বাধীনতার সুফল থেকে বঞ্চিত ও বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর ও ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। হত্যা করা হয় জাতীয় ৪ নেতাসহ হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা ও প্রগতিশীল নেতা-কর্মীদের। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে পদদলিত করে হরণ করা হয় মানুষের অধিকারকে। স্বৈরশাসকের সীমাহীন দুঃশাসন ও নিপীড়নে দিশেহারা হয়ে পড়ে মানুষ।

এমনি এক প্রেক্ষাপটে দিশেহারা বাংলার জনগণকে তার ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে স্বৈরশাসকের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে, প্রাণের মায়াকে তুচ্ছ করে, স্বজন হারানোর শোককে শক্তিতে পরিণত করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালের ১৭ মে ফিরে আসেন স্বদেশের মাটিতে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সাহসী ও সৃজনশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে সকল অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে। ঘুরে দাঁড়িয়েছে ইতিহাসের চাকাকে এগিয়ে নিয়ে এক উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সেদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ফিরে এসেছেন বলেই বদলে গেছে আজকের বাংলাদেশের চিত্র। সম্ভব হয়েছে জাতির পিতার হত্যার বিচার এবং জাতির পিতার আরাধ্য কাজ এগিয়ে নেওয়ার অব্যাহত অগ্রযাত্রা।

পক্ষান্তরে তিনি স্বদেশে ফিরে না এলে বাংলার জনগণ ফিরে পেতো না তার গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক অধিকার। বাংলাদেশ পরিণত হতো উগ্র জঙ্গি গোষ্ঠির চারণভূমিতে। তিনি ফিরে না এলে একটি অকার্যকর ও ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হতো লাখো শহীদের রক্তে অর্জিত প্রাণের বাংলাদেশ।

আর তাই ১৭মে - এই দিনটি আমাদের জাতীয় জীবনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই দিনটি আমাদের আত্মোপলব্ধির দিন, আত্ম অনুসন্ধানের দিন, এগিয়ে চলার শপথ নেওয়ার দিন।

আসুন, স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিনে শপথ নিই গণতন্ত্রের মানসকন্যা ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার বাংলার দুখী মানুষের নেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে যে কোনো মূল্যে আমরা যুদ্ধপরাধের কলঙ্কমুক্ত অসাম্প্রদায়িক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলবো।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

শামসুজ্জামান খান

বাঙালি জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এই অর্জন বিশ্বসভায় কেবল বাঙালি জাতির আত্মপরিচয়ই প্রতিষ্ঠা করেনি; আন্তর্জাতিক দৃশ্যপট পর্যন্ত বদলে দেয়। খুলে যায় অমিত সম্ভাবনার স্বর্ণ দুয়ার। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা-বিরোধী দেশি-বিদেশি চক্র স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করার পর দক্ষিণ এশিয়ার এই অপার সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির অস্তিত্বকেই প্রায় বিপন্ন করে তুলেছিল। এই নতুন রাষ্ট্রের চার রাষ্ট্রনীতি– গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের আদর্শকে কেটেছিঁড়ে একে একটি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানি ধাঁচের রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার প্রয়াস চালায় রাষ্ট্রপিতার হত্যাকারী তাদের দোসর সামরিক খুনিচক্র। ফলে এই অঞ্চলের শান্তি, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও স্থিতিশীলতার পরিবর্তে দেখা দেয় সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং পালাক্রমিক সামরিক অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থানের খেলা। তিন-চার বছর ধরে সামরিক বাহিনী এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তীব্রভাবে ক্ষমতার লড়াই ও বহুপাক্ষিক হত্যা-খুন-গুমের ঘটনার পর সামরিক স্বৈরশাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতাকে বৈধতা দান করার লক্ষ্যে 'হ্যাঁ-না' গণভোটের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদটি দখল করে নেন। উল্লেখ্য যে, বিশ্বের ঘৃণিত স্বৈরশাসক হিটলারও এ ধরনের গণভোটের মাধ্যমে তার ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করেছিলেন। জিয়াউর রহমানের এই লোকভুলানো কৌশলের পরও দেশে শান্তি-স্বস্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসেনি। নিত্যদিন বহু তরুণের নিখোঁজ হয়ে যাওয়াসহ সেনাবাহিনীর হাজার হাজার লোককে হত্যা করেও তিনি তার ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে পারেননি। সেনাবাহিনীর ভেতরেই ক্ষমতার লড়াই আরো তীব্র আকার ধারণ করে এবং প্রায় ১৮টির মতো ব্যর্থ অভ্যুত্থান সঙ্ঘটিত হয়। দেশ যখন এরকম একটি জটিল-কুটিল চক্রান্ত-প্রতিচক্রান্তের আবর্তে নিমজ্জিত ঠিক তখনি ১৯৭৫ সালে বিদেশে থাকায় ঘটনাক্রমে বেঁচে যাওয়া বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালের ১৭ই মে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। মহান পিতার আজীবনের সংগ্রাম ও তার প্রণীত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মৌলিক চার রাষ্ট্রনীতি, গণতন্ত্র; গণমানুষের আর্থ-সামাজিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কর্তব্য সম্পাদন করার অঙ্গীকারই ছিল তার মাতৃভূমিতে ফিরে আসার মূল লক্ষ্য।

বঙ্গবন্ধু এবং চার চাতীয় নেতাকে হত্যার ফলে সৃষ্ট নেতৃত্বের শূন্যতা পূরণের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া দল আওয়ামী লীগ তার কাউন্সিলে সর্বসম্মতিক্রমে শেখ হাসিনাকে তার অনুপস্থিতিতে দলের সভাপতি নির্বাচিত করে। বাংলাদেশের মানুষ বঙ্গবন্ধু কন্যা এবং তাদের প্রিয় রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের নতুন সভাপতি শেখ হাসিনাকে সাদরে বরণ করার জন্য বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও নতুন প্রত্যাশায় উদ্দীপ্ত হয়ে ১৯৮১ সালের ১৭ মে বর্ষণমুখর দিনে ঢাকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সমবেত হয়। ব্যানারসজ্জিত শ্লোগানমুখর লক্ষ লক্ষ মানুষের মিছিলের ঢল নেমেছিল সেদিন বিমানবন্দরে। উপস্থিত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার হর্ষধ্বনি, করতালি ও আবেগঘন ফুলেল শুভেচ্ছায় আওয়ামী লীগের সভাপতির স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ঘটনাটি ঐতিহাসিক মর্যাদা এবং নতুন রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে।

দুই

রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান হলেও শেখ হাসিনা সরাসরি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন না। তবে ছাত্র-রাজনীতির অভিজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠায় দেশের সামগ্রিক রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর একটা সুস্পষ্ট ধারণা যে ছিল সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর ছ'বছর বিদেশে বাধ্য হয়ে অবস্থান করার সময়ে সামরিক স্বৈরাচারী সরকার আওয়ামী লীগকে নানাভাবে কোণঠাসা ও ধ্বংস করার অপতৎপরতা রুখে দাঁড়ানোর লক্ষ্য নিয়েই তিনি নিয়েই স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। জেনারেল জিয়াউর রহমান তখন দেশের সর্বেসর্বা। তাদের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে নানা কৌশলে বাধাগ্রস্ত করারই শুধু চেষ্টা করা হয়নি নানাভাবে আওয়ামী লীগ ও তাঁকে নিন্দিত করার অপচেষ্টা করা হয়। ভরসার কথা, দেশের মানুষ সেসব বিশ্বাস করেনি। তারা বরং শেখ হাসিনাকেই দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ বাস্তবায়নে সক্ষম নেত্রী হিসেবে বিপুল সংবর্ধনার মাধ্যমে গ্রহণ করে নিয়েছেন।

নিজ ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করে জেনারেল জিয়া জাতি ও বিশ্বকে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের একটি ছদ্ম চেহারা দেখানোর লক্ষ্যেই সামরিক ছাউনিতে নিজের রাজনৈতিক দল গঠন করে। ১৯৭৯ সালে রিমোট কন্ট্রোলের সংসদ নির্বাচনে নিজ দলকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেয়। তবে অন্য কয়েকটি দল থেকেও এক দু'জন প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করে এনে আওয়ামী লীগকে মাত্র ৩৯টি আসনে জিততে দিয়ে কোণঠাসা ও বিপর্যস্ত করে রাখে। এই অবস্থায় আওয়ামী লীগকে পূর্বের মতো গণসমর্থনসহ একটি শক্তিশালী জাতীয় রাজনৈতিক দলে পরিণত করা এবং দেশে গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে আওয়ামী লীগের নতুন নেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করেন।

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে জীবনের ঝুঁকি ছিল। কিন্তু তিনি সে ঝুঁকিকে গুরুত্ব না দিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের এক সপ্তাহ আগে ১১ই মে তারিখে নিউজ উইকে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "জীবনের ঝুঁকি নিতেই হয়। মৃত্যুকে ভয় করলে জীবন মহত্ত থেকে বঞ্চিত হয়।" তাঁর রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্পর্কে ওই সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধুর উত্তরাধিকারী তরুণ নেত্রী বলেন, "যেসব কাজ অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য বলে আমি বিবেচনা করি তার মধ্যে থাকবে দেশের প্রত্যেকটি মানুষের পূর্ণ গণতান্ত্রিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।" তিনি আরো বলেন, "আমাকে আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত করে দলের নেতাকর্মীরা আমার মহান পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। আমি তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার প্রত্যয় নিয়েই স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করবো।"

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে শেখ হাসিনা তাঁর কথা রেখেছিলেন।

তিন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের সপ্তম অনুচ্ছেদে (ক) বলা হয়েছে, 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এ সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হবে।'

শেখ হাসিনা 'বিপন্ন গণতন্ত্র লাঞ্ছিত মানবতা' শীর্ষক তাঁর একটি লেখায় সংবিধানের উপর্যুক্ত অংশটি উদ্ধৃত করেছেন। এখান থেকেই তাঁর সংবিধানের প্রতি আস্থা এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নির্দেশনা কোথা থেকে কীভাবে আসবে তা উপলব্ধি করা যায়। উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধুই বাংলাদেশের সংবিধানে ওই অংশটি মৌলিক আইনের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে সংবিধানের প্রতি শাসকদের উপেক্ষা-অবহেলা এবং গণতন্ত্রকে কখনোই নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত না করায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোয় মানবিক অধিকার, সুশাসন ও গণতান্ত্রিক জীবনধারা গড়ে তোলার সুযোগ নেই দেখেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়মতান্ত্রিক পন্থা ও বিপ্লবী ধারার এক স্বকীয় কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। বাংলাদেশেও সামরিক স্বৈরশাসক ও অগণতান্ত্রিক শক্তির রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কব্জা করে রাখার বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে ধারাবাহিক গণতান্ত্রিক সংগ্রাম এবং প্রবল গণআন্দোলনের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রয়াস চালিয়ে সাফল্য লাভ করেছেন। বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনার রাজনীতির মধ্যে অনেক মৌলিক সাযুজ্য ছাড়াও একটা জায়গায় বিশেষ মিল লক্ষ করি, সেটি হলো সাহস। বঙ্গবন্ধুর সেই অসীম সাহসের কিছুটা শেখ হাসিনাও উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন।

উদাহরণ হিসেবে ১৯৮৭ সালে ঢাকায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে যে অগ্নিঝরা মিছিলে নূর হোসেন শহীদ হন সেই মিছিলের একেবারে ভেতর থেকে নেতৃত্ব দেয়া শেখ হাসিনার অসম সাহস এবং ১৯৮৮ সালে চট্টগ্রামে তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের সমাবেশ ও মিছিলে গুলিবর্ষণের মাধ্যমে যে গণহত্যা চালানো হয় তার উল্লেখ করা যায়। ২০০৪ সালের ২১ আগস্টে ঢাকায় তাঁর সমাবেশে গ্রেনেড হামলাও ফ্যাসিস্ট খুনি চক্রের পৈশাচিক নিষ্ঠুরতারই উদাহরণ। বাংলাদেশের মৌল রাষ্ট্রসত্তা ও স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের এইসব ভয়ঙ্কর হত্যা-প্রচেষ্টার মধ্যেও শেখ হাসিনা তাঁর রাজনীতিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন অকুতোভয়ে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও দেশবাসীর কল্যাণের জন্য প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু ঝুঁকির মধ্যে থেকেও এমন সাহসিকতাপূর্ণ প্রত্যয়দীপ্ত রাজনৈতিক সংগ্রামের নজির বাংলাদেশে শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধুর জীবনেই দেখা যায়।

চার

গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মধ্য দিয়েই শেখ হাসিনা ধীরে ধীরে বাংলাদেশের বিপুল মানুষের মন জয় করতে সক্ষম হন এবং স্বৈরশাসক এরশাদের ভোট কারচুপি ও মিডিয়া ক্যুর নির্বাচনী প্রহসনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলে রাখার ভিত্তিকে নড়বড়ে করে দেন। তখন তিন জোটে বিভক্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অভিন্ন লক্ষ্যে ভিন্ন ভিন্ন মঞ্চ থেকে এই সংগ্রামে যুক্ত হওয়ায় আন্দোলন নতুন এক গুণগত স্তরে উন্নীত হয়। ফলে বাধ্য হয়ে রাষ্ট্রপতি এরশাদ ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন এবং একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে নির্বাচন ও সংসদীয় গণতন্ত্রের সূত্রপাত হয়। এক্ষেত্রে শেখ হাসিনার ভূমিকা ছিল নিয়ামক। এই গণতান্ত্রিক পন্থায় ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে তিনি দেশের গণতন্ত্র, স্থিতিশীলতা, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি প্রথম লক্ষ্য নির্ধারণ করেন বৃহৎ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নই হবে তাঁর গণতান্ত্রিক শাসনের মূলভিত্তি। তিনি তাঁর একটি লেখায় বলেছেন, "আমি মনে করি আমাদের রাজনীতির একটা পরিবর্তন প্রয়োজন।... আন্দোলন হবে সমাজ সংস্কারের জন্য, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য। আর এ উন্নয়ন মুষ্টিমেয় মানুষের জন্য নয়। এ উন্নয়ন অবশ্যই হতে হবে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জন্য, সমাজের অধিকাংশ মানুষ যারা বঞ্চিত, জীবনের নানারকম চাহিদা মেটাতে পারে না। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা হতে বঞ্চিত.. বঞ্চিত একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই থেকে। বঞ্চিত কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে।" তাদের সামগ্রিক উন্নয়নই তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের অংশ। উন্নয়নকে এভাবে বিন্যস্ত করতে পারলে দারিদ্র্য দূরীকরণও সম্ভব এবং সামাজিক স্বস্তি ও শান্তিও তাতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এই লক্ষ্য নিয়েই তিনি দেশ শাসনের মৌলনীতি নির্ধারণ করেছেন।

আমাদের এই অঞ্চলের স্থিতিশীল সামাজিক অগ্রগতির লক্ষ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শেখ হাসিনাকে আরো অনেক বেশি কার্যকর ও দূরদর্শী ভূমিকা পালন করতে দেখি। পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তি এই ব্যাপারে বিশ্বে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু পাহাড়ি মানুষকে তাদের বসতি, সাংস্কৃতিক অধিকার সংরক্ষণ ও শান্তিপূর্ণভাবে বাঁচার অধিকার দিয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর স্বৈরাচারী সামরিক সরকার সেখানে যে দুঃশাসন ও নিপীড়ন চালালো তাতে সেখানে শুধু স্বাভাবিক শান্তি বিনষ্ট হলো না, শত শত শরণার্থী দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করলো এবং হাতে অস্ত্র তুলে নিলো তাদের অধিকার রক্ষার দাবিতে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সৃষ্টি হলো যুদ্ধাবস্থা, রক্তপাত ও ভ্রাতৃঘাতী হানাহানি। এতে শুধু পার্বত্য অঞ্চলের শান্তি বিনষ্ট হলো তাই নয়, এর প্রভাব পড়লো সারাদেশে এবং দেশের সামরিক বাহিনীর জন্য তা হয়ে উঠলো এক অস্বস্তির বিষয়। পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে গেলো যে বিশ্বব্যাপী ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে নিপীড়নের অভিযোগে অভিযুক্ত হলো বাংলাদেশ। এমন একটি অবস্থায় ১৯৯৭ সালের ২২শে ডিসেম্বর শেখ হাসিনা পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষর করে ওই অঞ্চল এবং গোটা দেশে যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করলেন তা গোটাবিশ্বকেই অভিভূত করে। শেখ হাসিনার এই রাষ্ট্রনায়কোচিত উদ্যোগ এবং পাহাড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা শুধু বাংলাদেশে নয় তাকে বিশ্বেরই এক শান্তি ও উন্নয়নের রূপকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

শুধুই শান্তিচুক্তি নয়, ১৯৯৬ সালের ১২ই ডিসেম্বর ভারতের সঙ্গে দীর্ঘকালের অমীমাংসিত গঙ্গার পানিচুক্তি স্বাক্ষরও তাঁর এক ঐতিহাসিক সাফল্য। আন্তর্জাতিক এই সমস্যার সমাধানের সমান্তরালে দেশেও তিনি উন্নয়নমূলক বহু উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৯৭ সালের ২৩শে জুন উত্তর বাংলার সঙ্গে পূর্ব বাংলার যোগাযোগে শত বছরের অবহেলার অবসান ঘটিয়ে তিনি উদ্বোধন করলেন দেশের সর্ববৃহৎ ঐতিহাসিক বঙ্গবন্ধু সেতু। ২০০০ সালে তাঁরই উদ্যোগে আমাদের মহান ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পেল। ১৯৯৬ সালের তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলেই বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো খাদ্যে উদ্বৃত্ত দেশ হিসেবে পরিগণিত হলো।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১৯৯৬-২০০১'র শাসনকালে এ ধরনের আরো বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিশেষ করে পার্বত্য শান্তিচুক্তি প্রতিষ্ঠার সাফল্যের জন্যে ১৯৯৯ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর শেখ হাসিনাকে ইউনেস্কোর শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। তাঁর এই অনন্য সাফল্যের কারণেই তিনি 'ডটার অব ডেমোক্রেসি' হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পান। উন্নয়ন, দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও যাতায়াতের অবকাঠামো নির্মাণে সাফল্য, সহায়-সম্পদহীন দুখী মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন, কৃষিক্ষেত্রে বৈপ্লবিক অগ্রগতি, মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি, নারী উন্নয়ন প্রভৃতি কারণে তিনি জাতীয় নেতা থেকে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অঙ্গনের একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে পরিচিতি পেতে থাকেন। তাঁর এই সাফল্য একমাত্র বঙ্গবন্ধু ছাড়া বাংলাদেশের আর কোনো রাজনৈতিক নেতার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় না। সেজন্যই শুধু ইউনেস্কোর 'ফেলিক্স হুফে বয়েনি শান্তি পুরস্কার' নয়, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাফল্য লাভ করার জন্য জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার 'সেরেস পদক' নরওয়ের মহাত্মা গান্ধী ফাউন্ডেশনের 'গান্ধী পদক' প্রভৃতি লাভ করেন। আরো একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দারিদ্র্য বিমোচনে শেখ হাসিনার সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ রাষ্ট্র ক্ষমতার বাইরে থাকা সত্ত্বেও ইতালিতে অনুষ্ঠিত জি-৮ সম্মেলনে তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এক বিরল সংবর্ধনা প্রদান করে। ক্ষমতার বাইরে থাকা এশীয় দেশের কোনো নেতাকে এভাবে আমন্ত্রণ জানানোর নজির নেই। তিনি যে বিশ্বের একজন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতার আসনে স্থান লাভ করেছেন এই ঘটনা তারই প্রমাণ। নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীর উন্নয়নের ক্ষেত্রেও শেখ হাসিনার বিশাল সাফল্য বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে।

২০০৯ থেকে দ্বিতীয় মেয়াদে দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। দিনবদলের অঙ্গীকার, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সমস্যার সমাধান, মাথাপিছু আয় ১১৪০ ডলারে উন্নীতকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা ও এমডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জাতিসংঘের সাউথ সাউথ পুরস্কার লাভ, ১ কোটির ওপর মানুষের কর্মসংস্থান, সমুদ্র জয় তথা প্রায় বাংলাদেশের আয়তনের সমপরিমাণ সমুদ্র সীমায় সার্বভৌমত্ব অর্জন, শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন, ৩ কেটি শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে ২৭ কোটি বই প্রদান, ও শতভাগ শিশুর স্কুলে ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, দক্ষিণ এশিয়ায় শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হর হ্রাসে রেকর্ড অর্জন, ঢাকা-চট্টগ্রামে অসংখ্য উড়াল সেতু নির্মাণ, পাটের ও ছত্রাকের জন্ম রহস্য আবিষ্কার এবং বিশ্বমন্দা সত্ত্বেও দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশকে বিশ্বসভায় এক নতুন মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। তৃতীয় মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরও তিনি উন্নয়ন ও বিকাশের এই ধারা অব্যাহত রেখেছেন।

আরেকটি বিষয় আলোচনা না করলে শেখ হাসিনার পরিপূর্ণ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয় না। রাজনৈতিক শত ব্যস্ততার মধ্যেও লেখালেখির ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা আমাদের বিস্মিত করে। তাঁর লেখায় রাজনৈতিক নানা বিষয় যেমন স্থান পেয়েছে তেমনি তাঁর জীবনদর্শন এবং কর্মকৌশল ও কর্মনীতির প্রতিফলনও বটে। তাঁর লেখার ভাষায়ও পটুত্ব ও পরিশীলন লক্ষ্য করা যায়। লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশের রাজনীতিবিদেরা কেউই বোধহয় গুরুত্বের সঙ্গে লেখালেখির কাজ করেন না। বড়ো ব্যতিক্রম শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর কন্যা হিসেবে শেখ হাসিনা পিতার ওই উত্তরাধিকারটিও যে পেয়েছেন সেটি আমাদের জন্য এক পরম পাওয়া।

শেখ হাসিনা শুধু আমাদের দেশ বা আমাদের এই অঞ্চলেরই নন, গোটাবিশ্বেরই একজন বিশিষ্ট রাষ্ট্রনেতা হিসেবে দেশে-বিদেশে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। তিনি তাঁর আদর্শ, পরিকল্পনা ও জীবনবোধের আলোকে বহুক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন, সংস্কারসাধন এবং প্রয়োজনীয় উন্নয়ন সাধন করে বাংলাদেশকে বিশ্বে দিয়েছেন নতুন ভাবমূর্তি এবং অপার সম্ভাবনার এক দেশের গৌরবোজ্জ্বল পরিচিতি। এজন্যই বিশ্বের সমাজচিন্তক এবং অর্থনীতিবিদেরাও বাংলাদেশের এত দ্রুতগতিতে সামনে উঠে আসা এবং সামাজিক সূচক ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারে চিত্তাকর্ষক অগ্রগতি লাভ করায় বিস্মিত হয়েছেন এবং তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, "বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যেই একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হবে।" এই সাফল্যের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

জয়তু শেখ হাসিনা।

ডিএফপি নং ০৯-১৫/০৫/২০১৪